আনারসের রাজ্য মধুপুর

নিবিড় চৌধুরী

হঠাৎ ব্যাগপত্তর গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ার বাতিক আছে আমার। সে একদিনের নোটিশে হোক বা কয়েকদিনের; বেরিয়ে পড়তে পারলে মনে শান্তি লাগে। অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল মধুপুর জঙ্গলে রাত কাটাব। সেই ইচ্ছে অবশ্য এখনো পূরণ হয়নি। তবে মধুপুরে যাওয়ার সুযোগ হলো।

অফিস থেকে ৪ দিনের ছুটি নিয়ে পড়লাম বেরিয়ে। ছুটি আগেই নিয়েছিলাম অফিস থেকে। ভাবছিলাম কোথায় যাব। এমন সময় রাসেল ভাইয়ের ফোন। প্রস্তাব দিলেন, টাঙ্গাইল যাওয়ার। আগেই জানিয়েছিলাম, উনি কোথাও গেলে জানাতে। সেই কারণে এই প্রস্তাব। একটু বলে রাখি, রাসেল ভাই এক প্রকাশক ও এক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডজাংক ফ্যাকাল্টি। তার বাড়ি টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরে।

আমাদের যাত্রা এবার সেদিকে। রাসেল ভাইদের পুরো পরিবার থাকেন ঢাকায়। গ্রামের বাড়িতে যান কদাচিৎ। হয়তো বছরে একবার। দুই ঈদে। এবারও পরিবার নিয়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে নিলেন আমাকেও। বাসাবো থেকে রিজার্ভ মাইক্রো বাস নিয়ে আমাদের ছুটে চলা শুরু হলো সকালে। এরপর সাভার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শালবন ও সেগুনের সারির সবুজ দেখতে দেখতে আমাদের যাত্রা। ঢাকার দূষিত বায়ু ছেড়ে একটু স্বস্তি ও সুবাতাস ভরে নিলাম ফুসফুসে। মাইক্রোতে রাসেল ভাইয়ের দুই বোন, চাচা-চাচী ও তাদের দুই সন্তান। গাড়িতেই ব্রেকফাস্ট সারলাম সেদ্ধ ডিম, কলা ও পাউরুটি দিয়ে। ড্রাইভার রসিক লোক। পুরোনো দিনের বাংলা সিনেমার গান চালিয়ে দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলেন। একের পর এক বাজছে, 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা', 'আমি সাত সাগরের ওপার হতে', 'আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো'। মেলোডি আর হেলেদুলে গাড়ি চলায় সবার ঝিমুনি এসে গেল। সবাই নিশ্চুপ। ঢাকার সকালের ব্যস্ততা আর ছোট ছোট সরু রাস্তা ফেলে কখন যে আমরা টাঙ্গাইল সদরে ঢুকে পড়লাম খেয়াল নেই। আড়মোড়া ভেঙে জানালার ফাঁক গলে দেখি রাস্তায় মানুষের গিজগিজ। রাস্তার দুই পাশে সকালে হাট বসেছে হয়তো। আমরা ওখানে নেমে একটু বিরতি দিলাম। চা খেলাম। মানুষের সারাদিনের ব্যস্ততার প্রথম পাঠ শুরু হলো।

গাড়ি ছুটল ভুয়াপুরের দিকে। বেশিক্ষণ লাগল না। টাঙ্গাইল সদর থেকে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে। খুব ছিমছাম উপজেলা ভুয়াপুর। আগে হয়তো এর নাম ছিল ভুএঞাপুর বা ভুঁইয়াপুর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি বিপর্যের ফলে নাম পাল্টে গেছে। ছোট সরু রাস্তায় ঢুকতে ঢুকতে দেখলাম দুই পাশে কাঁঠাল গাছের সারি। গ্রীষ্মের শেষ সময় এখন। বৃষ্টিও হচ্ছে মাঝেমধ্যে। কিছুদূর পিচঢালা, কিছুদূর কাঁদামাটি পেরোতে হলো। গাছে কাঁঠাল ঝুলে আছে। কেউ হাতটিও লাগাচ্ছে না। রাসেল ভাইদের একতলা আধপাকা বাড়ি। কেউ এখন না থাকায় জরাজীর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আমরা পৌঁছলাম বেলা ১১টায়। একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে। ভেজা গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

দুপুরে খেয়ে হালকা গড়িয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম রোদ পড়তেই। উদ্দেশ্য গ্রামের আশেপাশে ঘুরে দেখা। ভুয়াপুর ঘনবসতিপূর্ণ নয়। রাসেল ভাইদের বাড়ির দুই পাশ ঘিরে ধানী জমি। মৌসুমে চাষবাষ হয়। এখন ফসল তোলা মাঠ খা খা করছে। আরেকটি বর্ষার অপেক্ষায় কৃষকেরা। বাড়ির আশেপাশে জঙ্গলাকীর্ণ। মুসলমান ও হিন্দু, দুই সম্প্রদায় শত বছর ধরে বাস করছে ভাইয়ের মতো। মসজিদে আযান হচ্ছে তো মন্দিরে পূজা পাঠ। কোরবানির দিনে হচ্ছে রথযাত্রাও। দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এমন সুন্দর সহজ সম্মিলন দেখে মন ভরে গেল। গ্রামে সংখ্যায় অবশ্য মুসলমান বেশি। তারা যেন রক্ষা করছে হিন্দু ভাইদের বাড়িঘর। প্রায় বাড়ির উঠানে গোয়ালঘর ও ছোট পুকুর চোখে পড়ে। গৃহস্থের ভিটেয় বাঁশঝাড়ও রয়েছে। মাটির রাস্তা উঠে গেছে গৃহস্থের একচালা ন্যুজ ঘরের কপাট পর্যন্ত। আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ঝিনাই নদী দেখতে। যমুনা বিধৌত ঝিনাই বেশ বড়। বর্ষায় দু'কূল প্লাবিতও হয়। তখন কষ্টের শেষ থাকে না। তবে এখন অনেককে দেখা গেল মাছ ধরতে। পানি আছে যথেষ্ট। রাস্তায় বৈদ্যুতিক বাতি না থাকায় সন্ধ্যার আঁধারকে মনে হচ্ছিল গভীর রাত। ঝিনাই নদীর চারপাশে বড় বড় ধানী জমি। গরু চরছে। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। এসব দেখে মুগ্ধ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এরপর আমরা সেখান থেকে টমটমে চড়ে গেলাম ফলদা ইউনিয়নে। টাঙ্গাইলের মিষ্টির দেশখ্যাতি। না খেলে কী চলে! বিশেষ করে চমচমের। ফলদা বাজারে ঘুরে ঘুরে বাজার সওদার পাশাপাশি চমচমও খেলাম। গেলাম পাঁচআনি বাজারেও। টাঙ্গাইল শহরের এই বাজারের পরিচিতি 'মিষ্টিপট্টি' নামে। লোকমুখে

শুনলাম, শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই বাজারে ছোট-বড় ২০টি মিষ্টির দোকান আছে। এসব দোকানে প্রতিদিন গড়ে ৫০ মণ মিষ্টি বিক্রি হয়। একেকটি চমচম মুখে দিতেই মাখনের মতো গলে গেল। বুঝলাম, এই অঞ্চলের মিষ্টির খ্যাতি এমনিই হয়নি। ওখান থেকে ফের ফিরে এলাম ভুয়াপুরে। রাতে বসলাম ঝিনাই নদীর পানি ঢুকে পড়া এক বিশাল বিলের পাড়ে। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে ঠান্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়াতে আমাদের মতো অনেকে এসেছেন। রাতের নীরবতা চিরে মাঝেমধ্যে টুংটাং শব্দে সাইকেল ছুটে যাচ্ছে। বিলের পাড়ে পানি জমে লেকের মতো সৃষ্টি হয়েছে। আর পাড়ে চেরাগ জ্বালানো নৌকায় বসে মাঝি হাঁক দিচ্ছে বাড়ি ফেরার।

পরেরদিন আমরা সকালেই রওনা দিলাম মধুপুরের উদ্দেশে। এতদূর এসে মধুপুর জঙ্গলে না গেলে চলে! মানুষের আদিম বাসস্থানের কাছে গেলে নিজেরও আদিম হতে ইচ্ছে করে। ভুয়াপুরের মতো মধুপুরও টাঙ্গাইলের একটি উপজেলা। ভুয়াপুর থেকে ফলদা বাজার। সেখান থেকে সিএনজি অটোরিকশাতে এলাম ঘাটাইল। সেখান থেকে আমরা চললাম মধুপুরের পথে। যেতে যেতে চোখে পড়ল দুই পাশের বিশাল বিশাল ধানী জমি। বুঝতে কষ্ট হলো না, এখানকার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। মধুপুর সদরে ঢুকতে আমাদের স্বাগত জানালো বিশাল এক আনারসের চত্বর। তার চারপাশে সিএনজি অটোরিকশার সারি। একটু এগিয়ে আমরা গেলাম মধুপুরের কবি শুভ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এখানে এক ফার্মেসি খুলে দিব্যি জীবনযাপন করছেন তিনি। তিন জনে হালকা চা নাস্তা সেরে রওনা দিলাম মধুপুর জঙ্গলের উদ্দেশে। সিএনজি অটোরিকশা রিজার্ভ করলাম ৩০০ টাকা দিয়ে। তবে মধুপুর জঙ্গলে যেতেই পড়তে হলো বিড়ম্বনায়। রাস্তায় যে বিরাট গর্ত হয়ে আছে! অনেক কষ্টে সেটি পেরোল সিএনজি অটোরিকশা। মধুপুর গড়ের বিখ্যাত জায়গা এটি। যেতে যেতে চোখে পড়ল এই ক্রান্তীয় বনভূমির শালবনের সারি। তবে মনটাও খারাপ হলো। জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। সেখানে শুরু হয়েছে বাণিজ্যিক চাষ। বিশেষ করে আনারস। টাঙ্গাইল যদি চমচমের শহর হয় তবে মধুপুর আনারসের রাজ্য। এখানকার রসালো, সুস্বাদু আনারসের খ্যাতি সুবিদিত। আমরাও সেই স্বাদ নিলাম। ছোট আনারস কেটেকুটে দিয়ে প্রতি পিস নিল ২০ টাকা করে। আনারস মুখে দিয়ে আমরা ঢুকলাম জঙ্গলে। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। বনের মাঝ দিয়ে চলে গেছে রাস্তা। মানুষের হাঁটাহাঁটির ফলে যেমনটা হয়। কিছু আগেই বৃষ্টি হয়েছে। আর ছিনতাইয়ের ভয়ে আমরা বেশিদূর এগোলাম না। সবুজ বনের কিছু ছবি আর পাখাপাখালি আর ঝিঁ ঝিঁর ডাকের ডাকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ফিরে এলাম।

সময়ের অভাবে দিনে গিয়ে দিনেই ফিরতে হলো। অবশ্য মধুপুরে থাকার মতো কিছু হোটেল আছে। ২০০ থেকে ৮০০ থাকার মধ্যে প্রতিরাতের জন্য ভাড়া পাওয়া যায়। রাতে থাকা হয়নি। দেখা হয়নি মধুপুরের আদি অধিবাসী গারোদের জীবনযাত্রা। তবে ফেরার সময় ২০০ টাকা দিয়ে নিলাম ১০টি আনারস। সময়ের অভাবে ঘাটাইলের নায়েব আলী বাজারের বিখ্যাত পিঁয়াজুও খাওয়া হয়নি। যাওয়া হয়নি সখিপুরের দাওয়াতেও। এমনকি খুব কাছে গিয়েও পাথরাইল ও চণ্ডী গ্রামের টাঙ্গাইলের বিখ্যাত তাঁতিদের দেখা হয়নি। তাদের বুননের শাড়ি যে জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে! এমনকি মধুপুরের আনারসকেও জিআই পণ্যের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠেছে। টাঙ্গাইলের চমচমকেও সেই স্বীকৃতি দেওয়া যায় কি না, সেটিও দেখার অপেক্ষা থাকলাম।